ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 256- 261
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.205

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘অর্ধেক আকাশ’: বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান

মহাদেব মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*
লক্ষ্মীশ্রী ঠাকুর, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 11.11.2025; Accepted: 12.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Suchitra Bhattacharya's *Ardhek Akash* is a powerful testimony to the life struggles and self-assertion of modern women. In the novel, the author shows that although society speaks of equal opportunities for women, in reality, they still face numerous obstacles. Whether in the family, workplace, or society at large, women constantly need to prove their worth. Yet, they are not mere victims but fighters. The women characters in the novel balance domestic responsibilities while simultaneously pursuing their dreams and identities. Bhattacharya illustrates that even educated and working women are compelled to confront rigid social values. Patriarchal attitudes continue to obstruct their progress. However, through these challenges, women are gradually establishing their position. They protest against injustice and move forward on the path of dignity and independence. *Ardhek Akash* is not only a portrayal of women's limitations but also a celebration of their indomitable strength and potential. Through this work, Bhattacharya makes it clear that women do not embody silence—they are indeed half the sky, and without their contribution, society cannot be complete. This message remains highly relevant today, as the questions of women's freedom and equality are still unsettled and incomplete.

Keywords: women's self-assertion, patriarchy, independence, women's position in society, struggle, identity, modern women

স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০ খ্রিঃ ১০ই জানুয়ারি-২০১৫ খ্রিঃ ১ই মে)। তাই তাঁর প্রতিটি লেখায় স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট। আমরা তাঁর উপন্যাস পড়লেই দেখতে পাই নারী স্বাধীনতার একান্ত প্রয়াস। নাগরিক জীবনের সংসারের চিত্র তাঁর লেখায় সব থেকে বেশি করে ফুটে উঠেছে। নারী সংসারের গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ নয়, সেই দৃষ্টান্তই লেখিকা তাঁর লেখায় সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে নারীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এক দুর্নিবার চেষ্টা আমরা দেখতে পাই তাঁর রচনায়। মানুষের মনের ভাবনা এবং বাস্তবের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব লেখিকা রূপ দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সংসার জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে নারী যখন পা বাড়িয়েছে বাইরের জগৎ-এ তখন নারীকে প্রতিমুহূর্তে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। শত বাঁধা অতিক্রম করে নারী তাঁর নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নারী আজও পারেনি সমাজে নিজের সম্মান সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। পুরুষের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে নারী পারেনি নিজেদের নতুন দিগন্তে পৌছে দিতে। নিজের ভালোবাসার টানে নারী নিজেই জড়িয়ে গেছে পুরুষের বাহুবন্ধে। নারীর এই বন্ধন মুক্তির চেষ্টাই লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে করে গেছেন। ঠিক এই রকমই একটি উপন্যাস ‘অর্ধেক

আকাশ' (জানুয়ারি-২০১২)। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে এক চাকরিজীবী নারীর অন্তর্বেদনা। স্বামীর অনুগামী হওয়াই কি আজও স্ত্রীর ধর্ম? লেখিকা সেই চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসে। তুলে ধরেছেন নারী বিশ্বের অন্দর মহল ও বহির্মহলকে। লেখিকা বাণী বসুর কথায় উঠে আসে সেই নারী কথার প্রসঙ্গ—

> ''চাকুরে মেয়ে, শিল্পী মেয়ে, ঘরণী, গৃহিণী মেয়ে এরা সবাই কীভাবে এই কঠিন সময়ের মোকাবিলা করছে। এই সময়ের অর্থাৎ বিশ্বায়নের আশেপাশের সমাজ চিত্রের একটা ডকুমেন্টেশন তার লেখার থেকে পাওয়া যায়।''[১]

'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসের নায়িকা পারমিতা কলেজে পড়ায়, বিষয় রসায়ন। এটাই তার একমাত্র পরিচয় হতে পারত যদি সে কোনো পুরুষ হত। কিন্তু সে যখন নারী তাই তার উপর আরও অসংখ্য পরিচয় বহনের দায়ভার। কখনো সে কারো স্ত্রী, কখনো কারো মা, কখনো কারো মেয়ে, কখনো আবার কারো পুত্রবধূ। প্রতিটি পরিচয়েই তাকে সমান দায়িত্বশীল হতে হবে। নারীকে প্রতিটি পরিচয়েই সমান গুরুত্ব দিতে হয়, কিন্তু পুরুষরা খুব সহজেই তা এড়িয়ে চলতে পারে। এই উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি পারমিতার ছেলে তাতারের জন্মদিন। সেই অনুষ্ঠানে তাতারের পিতা রাজর্ষি উপস্থিত থাকতে পারছে না অফিসের কাজের জন্য। আগের জন্মদিন দুটিতেও ছিল না। এমনকি অন্নপ্রাশনটাও রবিবারে করা হয়েছিল রাজর্ষির সুবিধার্থে। কোনো দিনই রাজা তার অফিসের কাজ ছাড়া কোনো কাজে দায়িত্বশীল নয়। কিন্তু পারমিতা কলেজ অধ্যাপিকা হয়েও সমস্ত দিক সামলে চলছে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও। পারমিতা তাই ভাবছে—

> ''ছেলের জন্মদিনে অফিসে ব্যস্ত থাকাটা বাবাকে মানায় এবং যত কাজই থাক মাকেই নিতে হয় ছুটিটা।''[২]

বাবা খুব সহজেই ছেলের জন্মদিনে অফিসে কাটাতে পারলেও মা পারেনি তার দায়িত্ব ভুলে কলেজে যেতে। নারীর কাছে আজও সংসার ধর্মই বড় সেকথাই যেন লেখিকা বলতে চেয়েছেন।

তাতারের জন্মদিনের পার্টির শেষ লগ্নে বাড়ি ফিরেছে রাজা। আত্মীয়-স্বজন ফিরে যাওয়ার পর কাজ সেরে পারমিতা বিছানায় এলে রাজা জানিয়েছে তার পদোন্নতির কথা। কোম্পানি তার কাজে খুশি হয়ে নতুন একটি কাজে বেঙ্গালোর পাঠাচ্ছে রাজাকে। পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়ছে তার। তাই খুশিতে আত্মহারা রাজা। খবরটা শুনে পারমিতাও লাফিয়ে উঠেছে, জড়িয়ে ধরেছে রাজাকে। বলেছে—

> ''এ তো গ্র্যান্ড নিউজ! ইস, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।''[৩]

কিন্তু রাজা যখন জানিয়েছে পার্মানেন্টলি তাকে বেঙ্গালোর চলে যেতে হচ্ছে তখন বোধোদয় হয়েছে পারমিতার। ক্ষণিকের মধ্যে বিষণ্ণতায় মন ভরে গেছে তার। কারন এক অজানা আতঙ্ক তাকে দগ্ধ করছে রাজা পুরোপুরি ভাবে বেঙ্গালোর চলে গেলে কি করবে পারমিতা! স্বামীর পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাময়িক সুখ এখন তার কাছে গভীর বেদনায় পরিণত। সে পারছে না স্বামীর এই সুযোগ নষ্ট করার কথা বলতে সেই সঙ্গে পারছে না রাজার পুরোপুরি ভাবে বেঙ্গালোর চলে যাওয়াটা মেনে নিতেও।

রাজার এই বেঙ্গালোর যাত্রাই পারমিতার জীবনে নিয়ে আসে এক গভীর সংকট। পারমিতা ব্যক্তিত্ব ও নারীত্বের টানাপোড়নে দগ্ধ হতে থাকে। রাজা বেঙ্গালোর যাত্রা করলে সবাই চেয়েছে পারোও তাকে অনুসরণ করে বেঙ্গালোর যাত্রা করুক। পারমিতার শাশুড়ি ফোন করে পারোর মাকে বলেছে তার ইচ্ছা অন্তত প্রথমবার পারো যেন রাজার সঙ্গে যায়। কিন্তু পারমিতা কিছুতেই নিজের চাকরি ছেড়ে স্বামীর অনুগামী হয়ে বেঙ্গালোর যেতে রাজি হয়নি। পারমিতার মা মেডিকেল লিভ নিয়ে রাজার সঙ্গে বেঙ্গালোর পাড়ি দিতে বললে সে জানায়—

> ''আর চাকরি করা ছেলেদের বুঝি ছুটি নেওয়ার কোন দায় নেই।''[৪]

সংসারের সমস্ত ক্ষেত্রে চাকরি করা ছেলেরা ছুটি নিয়ে সংসারের কাজে আত্ম নিয়োগ করে না। কিন্তু চাকরিজীবী মেয়েদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম ঠিক উল্টো। রাজার মা-বাবা দুজনে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ছেলের বউয়ের চাকরির টাকা তারা হাতে ছোঁয় না। হয়তো এটা তাদের সংস্কার। কিংবা মানে লাগে। তাই পারমিতা চাকরির টাকা দিয়ে নানা রকম জিনিস পত্রে সংসার সাজিয়েছে। ছেলেদের চাকরির টাকা মান বৃদ্ধি করে কিন্তু সে পুত্রবধূ বলে তার টাকা নিতে মানহানি হয়! এটাই কি সংসারের নিয়ম?

মেয়েদের আজও সব সময় স্বামীর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে এটাই অলিখিত নিয়ম। তাইতো রাজার ভাই রানা তার প্রেমিকা রঞ্জাবতীকে দেখাতে পারোকে নিয়ে গেলে রাজা বারণ করে দিয়েছে রানার প্রেমিকা নিয়ে পারমিতাকে মতামত দিতে— ''তুমি এসবে একদম থাকবে না।''[৫] রানা তার বৌদিকেই নিজের প্রেমের সাক্ষী করে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা রফা করার কথা বললে পারো কিন্তু না করতে পারেনি। এদিকে রাজার নিষেধ অমান্য করাও তার অসম্ভব। পারো ভাবছে সে নিজে কি করবে না করবে তা কি রাজা বেঙ্গালোর বসে ঠিক করে দিবে। রঞ্জাবতীকে দেখে পারমিতারও তাদের সংসারের উপযোগী মনে হয়নি। রঞ্জার পোশাক পরিচ্ছেদ তার শ্বশুর-শাশুড়ি মেনে নিতে পারবে না, এমনকি রানাদের বাড়ির কাড়ি কাড়ি বাসন মাজাও যে রঞ্জার সম্ভব নয় তা পারমিতা জানে। তবুও আবার পারমিতা ভাবে— ''মেয়ে তো, সংসার করতে গেলে কী না পারে।''[৬] পারো নিজেও যখন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত এমনকি এখনও যখন ছাত্রদের পড়ায় ল্যাবরেটরিতে প্র্যাক্টিকাল করায় সেই পারমিতা কি এই পারমিতা যে কিনা সংসারের জন্য সব করতে পারে।

পারমিতার বাবা অসুস্থ, মেয়ে হয়েও পারমিতা চেষ্টা করছে যথাসাধ্য। প্রতিদিন নিজের কলেজ সেরে বাবাকে দেখতে যায়। চিকিৎসারও প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা করেছে সে নিজেই। চিকিৎসা খরচাও চালাচ্ছে নিজের হাতে। এই টাকাটা যেন পারমিতার মা সুমিতা দেবী খুশি হয়ে নিতে পারছে না। কিন্তু কেন? পারমিতা যদি ছেলে হত তাহলে কি বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো না। তখন কি তার মা এমন সংকোচবোধ করতো। শুধু পারোর মা নয়, শাশুড়িও যে তার বাবার পিছনে এত ছোটা খুব ভালোভাবে নেয়নি তা তার প্রশংসার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত— ''পারমিতা একদম ছেলের মতো করছে।''[৭] মানসী দেবী চান না তার ছেলের বউ প্রতিদিন তার পিতার জন্য ছুটে যাক। তাই প্রশংসা করেই যেন মনে করিয়ে দিয়েছে— যে পারমিতা ছেলে নয় মেয়ে। তাই তার প্রতিদিন বাবাকে দেখতে যাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু মানসির মা সাধনা দেবী কিন্তু মেয়ের একথা মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিবাদ করে মানসীকে বলেছে, পারমিতা যোগ্য কাজ করেছে সে যদি এমনটা করতে না পারতো সেটা মানসীর নিজের সমস্যা কিংবা অক্ষমতা। মেয়েকে বলেছে— ''তা বলে আমার নাত বউয়ের গলায় একটা ভুলভাল সার্টিফিকেট ঝোলাস কেন? মুখে কেন আসে না, ও সন্তানের যোগ্য কাজই করছে।''[৮] সাধনা দেবী সারা জীবন নিজের স্বাধীন মত বাঁচতে চেয়েছে। কোন দিন কারো উপর নির্ভরশীল হতে চাননি, তা তার কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন—''নারীজন্ম তো খালি আছাড় খাওয়ার জন্যই রে। একটু সোজা হয়ে হাঁটতে গেলেই ধপাস।''[৯] সাধনা দেবীও চেয়েছিলেন স্বাধীন ভাবে বাঁচতে কিন্তু পারেননি। তাকেও তার স্বামী নিজের সত্ত্বা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে দেননি। এরকমই হাজার হাজার মানসীরা তাদের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীর চাহিদাকেই জীবনের পথ হিসাবে বেছে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে আজও বাধ্য হচ্ছে।

পারমিতা মেয়ে তাই তাকে অবহেলিত হতে হয় প্রতি পদে পদে। পারেনি, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে দিয়ে পারমিতা যেমন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে যেতে পারেনি। তেমনি নারী বলেই কলেজেও তাকে সব সময় কথা শুনতে হয়েছে। সবাই যেন ভাবে তার ক্ষমতা নেই একজন পুরুষের মত করে নিজের বিভাগ পরিচালনা করার। তাইতো আমরা রাখাল নাথকে বলতে শুনি— ''ডক্টর বিশ্বাস ঠিক আপনাকে গাইড করে করে ডিপার্টমেন্ট চালিয়ে নেবেন।''[১০] একথা পারমিতার আঁতে ঘা দিয়েছে। পারমিতা কি এতই অযোগ্য যে তাকে প্রতিপদে ডক্টর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু মেয়ে বলেই তাকে এই কথাটা বলতে পেরেছেন রাখাল বাবু। কলেজে অতিথি অধ্যাপক নির্বাচনেও পারমিতার পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাতারের অসুস্থতা কারণে পারমিতা একদিন মিটিং-এ উপস্থিত না থাকায় অধ্যক্ষ স্বপন বিশ্বাস কথা শুনিয়েছেন তাকে— ''তুমি তো সেদিন মিটিং-এ ছিলে না। ছেলের অসুখ না কী যেন অজুহাতে ওইদিন ডুব মারলে।''[১১] অনেক পুরুষ অধ্যাপক অনেক দিনই উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাও কিন্তু তাদের পারমিতার মত জবাবদিহি করতে হয় না।

পারমিতা রাজার একাকীত্ব দূর করতে ছুটি পেয়ে বেঙ্গালোর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছে। চাকরি ছেড়ে পারমিতা পাকাপাকি ভাবে রাজার কাছে চলে যেতে না পারলেও যতটুকু সুযোগ সে পেয়েছে রাজার কাছে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সেই অভাব পূরণের। তাই আমরা দেখি বেঙ্গালোর এসে পারো শুধু রাজার শারীরিক ও মানসিক চাহিদাই পূরণ করেনি, ঘর পরিস্কার থেকে রান্না সব কাজই করেছে স্বামীর জন্য। রাজা অফিসে গেলে পারো নিজে হাতে তিন রকমের মাছ, মুরগি, আনাজপাতি কিনে এনেছে। রান্না করেছে রাজার পছন্দের সব আইটেম। রাজাই বলেছে— ''এ

তো আমার মাস খানেকের খোরাক।''[১২] এত কিছু করার পরও কি রাজা বুঝেছে পারোকে? একটু পরেই সৌম্যের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে রাজা তার মনের লুকিয়ে রাখা গোপন কথা গুলি প্রকাশ করে ফেলে। ছেলের স্কুলে ভর্তি নিয়ে পারোকে তির্যক আক্রমণ করে বলে— ''আমার ইচ্ছের যখন ভ্যালুই নেই, তখন আমার মতামতেই বা কী আসে যায়?''[১৩] শুধু তাই নয় রাজা যে এতদিন পারোকে চাকরি ছেড়ে তার সঙ্গে বেঙ্গালোর এসে থাকতে বলেনি এটা একটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়, তাও প্রকাশিত হয়েছে। মাল খেয়ে ক্ষণিকের উত্তেজনায় রাজার মুখোশ খুলে পড়েছে। নেশাতুর স্বরে রাজা বলেছে—

> ''শি ইজ ভেরি অ্যাডামেন্ট। নিজে যা চায়, সেখান থেকে একচুল নড়বে না।.....কলেজ দেখায় আমায়? কলেজ? হুঁহ। ওই কলেজের মাইনেটা আমি ওকে হাতখরচা দিতে পারি।''[১৪]

রাজার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেছে সৌম্য ও তার স্ত্রী তানিয়া। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করেছে পারমিতার। রাজার কাছে শুধু টাকাটাই সব। পারমিতারও যে একটা জীবন আছে নিজস্বতা আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করেনি রাজা। শুধু টাকার জন্য পারমিতা অধ্যাপনা করে না তার নিজের ব্যক্তিত্বটাই প্রধান সেটা রাজাও বুঝলো না। একটু পরেই রাজা ক্ষমাও চেয়েছে পারোর কাছে। জানিয়েছে স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেও সৌম্যের মত করে বাঁচতে চায়। একা একা থাকা আর তার সম্ভব নয়। রাজা বলে—

> ''...সৌম্যদেরই তো কী চমৎকার হ্যাপি ফ্যামিলি... একা আমিই শুধু...রাজার গলাটা ভেজা ভেজা শোনাল, আমারও কি ইচ্ছা করে না, বলো?''[১৫]

এই করুণ আর্তি অবহেলা করা পারমিতার পক্ষেও যেন অসম্ভব। রাজার কাছে এসে পারমিতা ভেবেছিল না এলে বুঝি মহামূল্য কিছু হারাত, আর ফেরার পথে ভাবছে— ''এলেও যে কত কী হারায়!''[১৬]

পুজোর ছুটিতে উটি ঘুরতে যাওয়ার জন্য রাজা পারোকে বলেছিল কিন্তু পারো একটি কোর্স করবে বলে যেতে রাজি হয়নি সে বড়দিনের ছুটিতে এই ভ্রমণটা করতে বললে রাজা তার কথা রাখেনি। পারো যেতে না পারলেও বাবা-মা, পুত্রকে নিয়েই রাজা উটি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানসী পারোর না যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তাই পারো যখন মানসী দেবীর হাতে বিমানের টিকিত দিতে এসেছে তখন মানসী দেবী পারোকে তীব্র আঘাত হেনে জানিয়েছে— ''তোমার গোঁ থেকে তুমি তাহলে নড়লে না।''[১৭] মানসী আরও বলেছে— ''চাকরির বাহানা দেখিয়ে মেয়ে মানুষের এই ধরণের একগুঁয়েমি শোভা পায় না।''[১৮] একথা শোনার পর সবার একান্ত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে পারো আর পারছিল না নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে। মানসী দেবীর কথায় পারোর হৃদয়ে বর্ষার বারিধারা বইতে থাকে মুষলধারে। সংসার জিনিসটা বড় আজব জায়গা, এখানে কোন মেঘই চিরস্থায়ী হয় না। সেই নিয়মেই পারমিতা ও তার শাশুড়ির মান-অভিমানও এক সময় স্বাভাবিক হয়ে গেল। পুজোর ছুটিতে পারমিতাকে রেখেই সবাই বেঙ্গালোর চলে গেল উটি ভ্রমণের জন্য। পারমিতা একা পড়ে রইল নিজের পদোন্নতির জন্য একটি কোর্স করতে কলকাতায়। কিন্তু মাঝপথে পিতার মৃত্যুতে পারোর এই কোর্সটি করা সম্ভব হল না। রাজারাও উটি ভ্রমণ ত্যাগ করে কলকাতা ফিরে এল শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষে রাজা আবার ফিরে যাচ্ছে বেঙ্গালোর। এবার পারোর জীবনে প্রকৃত সংকটময়তার সময় উপস্থিত। এতদিন তাও পারোর পিতার অসুস্থতার কথা ভেবে সবাই পারমিতার কলকাতায় থাকাটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পারোর পিতার মৃত্যুর পর তার মাও চায় না পারমিতা রাজাকে ছেড়ে কলকাতায় পড়ে থাকুক। পারমিতা মায়ের অস্বাভাবিক আচরণের কথা বললে রাজা জানায়— ''আমি দেখতে চাইছিলাম পরবর্তী বাহানাটা এবার কীভাবে শুরু হয়।''[১৯]

বিবাহ বার্ষিকীতে রাজা পারমিতার জন্য ফুল পাঠিয়েছে সঙ্গে ছোট বার্তা 'মিসিং ইউ'। এই ছোট্ট কথাটিই যেন পারোকে বেঙ্গালোর ডেকে পাঠানোর জন্য যথেষ্ট। এই 'মিসিং ইউ' এর উত্তর পারো সারাদিন দিতে পারেনি। দিন শেষে পারমিতা উত্তর পাঠিয়েছে একই সুরে 'মিসিং ইউ'। এই বার্তার উত্তরে রাজা ফোন করে পারোকে জানিয়েছে সত্যিই যদি সে রাজাকে মিস্ করে তাহলে কলকাতায় পড়ে আছে কেন? দুজনে একই কথা পাঠিয়েছিল কিন্তু রাজা কেন বুঝলো না পারো রাজাকে কাছে চাইছে। 'মিসিং ইউ' বার্তা দেখে পারোর মনে হয়েছিল রাজা তাকে ডাকছে কিন্তু একই শব্দ পাঠ করে রাজার মনে হল না কেন— ''পারমিতাও তাকে চাইছে কাছে? এবং মিসিং ইউয়ের সমাধান যেন পারমিতারই যাওয়া রাজার চলে আসা নয়?''[২০] পরস্পরের প্রতি একই আহ্বান ভিন্ন অর্থ তৈরী করছে। এটাই সমাজের নিয়ম। আজও তাই স্ত্রীকেই তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে হতে হচ্ছে স্বামীর অনুগামী। তবুও নারীরা পারে না

সম্পর্কের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে পারমিতাও শেষ পর্যন্ত পারেনি। তাই সে ভাবছে— ''ভালোবাসারও তো একটা সাজা আছে। সেটা পেতে হবে বই কী।''[২১] শেষ পর্যন্ত পারমিতাও নিজের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছে। তাই ভালোবাসার শাস্তি হিসাবে অর্ধেক আকাশটাকেই জীবনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে।

কথাশেষ:

এই উপন্যাসে শুধু পারমিতা একা নয় প্রতিটি নারী চরিত্রকেই পুরুষের অনুগামী হয়ে চলতে বাধ্য হতে হয়েছে। রানার প্রেমিকা রঞ্জাবতী আধুনিকা জেনেও রানা তাকে ভালোবেসেছিল কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ আসতেই টার্মস দিয়েছে— ''আমি ফ্যামিলির সঙ্গে থাকব। ওকে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে।''[২২] রানা পারোকে একথা জানিয়েছে। রঞ্জাবতী রানার কথায় রাজি না হলে খুব সহজেই তাকে ভুলে গেছে রানা। আমরা দেখি রাজার দিদা বরের কথা অমান্য করে কলেজে পড়তে গিয়েছিল। স্বামীর কথা অমান্য করার শাস্তি তাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে— ''পাঁচ বছরে তিন বার গর্ভধারণ করিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল সেই বর।''[২৩] পারমিতার কাজের মেয়ে সরস্বতী মাত্র পঁচিশ বছর বয়স। দুটি সন্তানের মা। স্বামী অকর্মা, মাতাল। যা কাজ করে তাও মদ, চোলাই আর মোবাইলেই শেষ হয়। দুই সন্তান ও স্বামীর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব এই সরস্বতীরই। তবুও এই সরস্বতীকেও স্বামীর কথা মতই চলতে হয়। সেও পারে না সম্পর্কের বন্ধন ছিড়ে দিতে তাই সরস্বতী অপারেশন হতে চাইলে তার স্বামী জানায়—''ওতে নাকি মেয়ে মানুষের শরীরের ক্ষতি হয়। জোশ কমে যায়।''[২৪] স্বামীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিণতি হিসাবে আরও একটি সন্তান এসেছে তার পেটে। পারোর বান্ধবীর দিদি এনাক্ষী বরের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েও আজ বরের চেয়ে ছোট ডাক্তার। সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে বরের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে সে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে বরের অনুগামিতা মেনে নিয়েছে। তাই তাকে বলতে শুনি— ''বউয়ের হাইট বরের চেয়ে সর্বদা খানিকটা কম থাকে। সমান হয়ে গেলেই তো মুশকিল, তাই না?''[২৫] এই নিয়মকে মেনেই তার বড় ডাক্তার হয়ে ওঠা হয়নি। আমরা দেখি পারমিতার কলেজের অধ্যাপিকা শর্বরীকে। সে যখন স্কুল ছেড়ে কলেজের চাকরি পেয়ে কলেজে যোগ দিতে চেয়েছে, তখন তার স্বামী মেনে নিতে পারেনি। তাই শর্বরী যখন চাকরিতে যোগ দিয়ে বরকে বারাসাতে বাড়ি ভাড়া থাকতে বলেছে স্বাভাবিক ভাবেই তার স্বামী রাজি হয়নি। শর্বরীর কথায়— ''একেই স্কুল টিচারের অধ্যাপিকা বউ, তাতেই তার মান খোওয়া গেছে।''[২৬] তারপর আবার স্ত্রীর জন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এটা যেন কোন স্বামীর পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব না। শর্বরী মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাড়া থেকে কলেজ করেছে। কিন্তু স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেনি, সুখীও হতে পারেনি জীবনে।

এই উপন্যাসের প্রতিটি নারী চরিত্র তাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পড়েছে নারীত্বের সংকটে। সরস্বতী থেকে শুরু করে শর্বরী, রঞ্জা ও পারো সকলেই। প্রত্যেকটি নারীকে দেখি নিজের জীবনে অর্ধেকটা আকাশ নিয়ে বেঁচে থাকতে। পারমিতা একটি কলেজ অধ্যাপিকা হয়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে পারেনি। স্বামীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনে অর্ধেকটা আকাশই আপন করে নিয়েছে। আজও আমাদের সমাজ নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারেনি, দিতে পারেনি কর্মজীবি নারীদের প্রকৃত সম্মান। লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যও নারীর নিজস্ব পরিসরের উপস্থাপনায় তিনি নারীর একাকীত্ব, যন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন ঠিকই তবে পিতৃতন্ত্রের প্রতাপমুক্ত ভুবনকে তার হাতে তুলে দিতে পারেননি। সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার তলদেশ অবধি গভীর অনুসন্ধান করেননি। সেই চিত্রই অর্ধেক আকাশ উপন্যাসে প্রতিভাত। এই উপন্যাস পড়ার পর হয়ত পাঠকদের কর্মজীবী নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতেও পারে। আর তা যদি সম্ভব হয় তবেই আমরা নারীবাদী না হয়ে মানবতাবাদী হয়ে উঠতে পারবো— এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. সুচিত্রাকে মনে করে, কথানদী সুচিত্রা, পৃ. ৩৪।
২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা। অর্ধেক আকাশ। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ-জানুয়ারি ২০১২, তৃতীয় মুদ্রণ-আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৩।
৩. তদেব, পৃ. ১৮।
৪. তদেব, পৃ. ১৯।

৫. তদেব, পৃ. ৬০।
৬. তদেব, পৃ. ৬৫।
৭. তদেব, পৃ. ৭১।
৮. তদেব, পৃ. ৭১।
৯. তদেব, পৃ. ৭৬।
১০. তদেব, পৃ. ৮৩।
১১. তদেব, পৃ. ৮৮।
১২. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১১৯।
১৪. তদেব, পৃ. ১২০।
১৫. তদেব, পৃ. ১২১।
১৬. তদেব, পৃ. ১২১।
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৫।
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২০. তদেব, পৃ. ১৫৯।
২১. তদেব, পৃ. ১৬৭।
২২. তদেব, পৃ. ৯৮।
২৩. তদেব, পৃ. ৭৬।
২৪. তদেব, পৃ. ৭৮।
২৫. তদেব, পৃ. ১০১।
২৬. তদেব, পৃ. ১২৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। প্রথম প্রকাশ-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ- ১৯৮৪।
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের প্রতিমা। প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ১৯৭৪, পঞ্চম সংস্করণ-ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, কুনাল (সম্পাদক)। কথানদী সুচিত্রা (সুচিত্রা স্মারক গ্রন্থ) । পত্রভারতী, জানুয়ারি, ২০১৬ ।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে। পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ২০০৭।
৫. রায়, বিকাশ ও রায়চৌধুরী, অর্পিতা বর্মন। বিপ্লব: সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথাজগৎ। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, জুন, ২০১৮।
৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের বিনির্মাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দীপাবলি, ২০১০।